Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 165– 173
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে উনিশ শতকীয় নারী পরিসর চিত্রায়ণ : প্রসঙ্গ 'কলকাতার কাছেই' ও 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'

শ্রেয়সী আইচ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
ইমেইল : shreyasi.aich@gmail.com

Keyword
নারী, সমাজ, অবরোধ, রক্ষণশীলতা, স্ত্রীশিক্ষা, উপার্জনক্ষমতা, প্রগতি, প্রতিবাদ।

Abstract
উনিশ শতকে বঙ্গীয় নারীর গতানুগতিক পূর্বপ্রচলিত অবস্থানটিকে নিয়ে নতুনভাবে অনেক চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য একাধিক পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল এই সময়ে। সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ রদ, সহবাস সম্মতি আইন পাশ – প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ নারীকল্যাণ তথা মানবকল্যাণমূলক সমাজ-সংস্কারগুলি ঘটেছিল উনিশ শতকেই। বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়গুলি তাদের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার কারণে বারবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল উনিশ শতকের সমসময় থেকেই। বিশ শতকে ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালেও অতীতকে সাহিত্যে ফিরে দেখার একটা ধারা লক্ষ্য করা যায়। সেই সূত্রে উনিশ শতক স্বাধীনতা-পরবর্তী সাহিত্যে প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট হিসেবে উঠে এসেছে। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসে উনিশ শতকের শেষলগ্ন এবং আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে উনিশ শতকের শেষার্ধের সময়কাল প্রেক্ষাপটরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও দুটি উপন্যাসই স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে রচিত। বর্তমান প্রবন্ধে প্রথমে 'কলকাতার কাছেই' এবং তারপর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেই সময়ের প্রেক্ষিতে উপন্যাসে সামাজিক-পারিবারিক পরিসরে নারীজীবনই প্রবন্ধের মূল বিবেচ্য বিষয়। গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও আশাপূর্ণা দেবী- বাংলা সাহিত্যের দুই প্রথিতযশা সাহিত্যিকের জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে নির্বাচিত উপন্যাস নিয়ে আলোচনার পূর্বে। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসের প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্যাবলী দেওয়ার পর উপন্যাসে নারী-পরিসর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে রাসমণি, শ্যামাসুন্দরী, উমা প্রমুখ চরিত্রের আলোকে। রাসমণির মধ্যে যেমন একদিকে বৈধব্য সমস্যা, স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়কর্তৃক প্রতারণা, মা হিসেবে সন্তানদের ঢাল হয়ে দাঁড়ানো, অকূল পাথারে ভেসে না গিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে সৎপথে থেকে সন্তান মানুষ করা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এরই সঙ্গে বিবাহিত জীবনের নানা অত্যাচারের ঘটনায় প্রকৃত দোষীকেই তিরস্কার করে এবং অত্যাচারী স্বামীর ঘর করতে মেয়েদের বাধ্য না করে তিনি যথেষ্ট আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। লেখক এই নারীর নির্মাণ কিভাবে করেছেন সেটা আলোচনা করা হয়েছে সঙ্গে আবার নারীর সংস্কারাচ্ছন্নতার দিক নিয়েও যুগপৎ আলোচনা করা হয়েছে। শ্যামাসুন্দরী

এবং উমার মধ্যে একদিকে প্রতিবাদী নারীসত্তাকে লেখক দেখিয়েছেন, অন্যদিক নারী-আত্মার স্বাভাবিক জৈব চাহিদার দিকগুলিও লেখক দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন সূক্ষ্ম মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। সমকালীন সমাজ-পরিসরে দারিদ্র্য ও পুরুষের নানা অকর্মণ্যতার সঙ্গে যুদ্ধ করেও জীবনের টানে মেয়েদের লড়াইয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এরপর আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাস প্রসঙ্গে পর্যালোচনার পূর্বে লেখিকার জীবন ও সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে খুব সামান্য কিছু কথার উল্লেখ রয়েছে। উনিশ শতকে নারীপ্রগতিমূলক সংস্কারগুলির ক্ষেত্রে সমাজের কিছু মানুষ প্রগতিশীলতার আবার কিছু মানুষ রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে বৃহৎ সামাজিক পরিসর না দেখানো হলেও সত্যবতী ও তার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের বিভিন্ন চরিত্রের সমাগমে পারিবারিক নারী-পরিসরেও যেন ওইরকম দুটি প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল শিবির নির্মিত হয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য নারী প্রগতিশীলতার দিকে নিজের জীবন দিয়ে অবস্থান করেছিলেন সত্যবতী ও মুষ্টিমেয় কিছু চরিত্র। বর্তমান প্রবন্ধে সেই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। বাংলার মেয়েদের কথা, তাদের জীবনযাত্রা, শিক্ষার সুযোগ না থাকা, অত্যাচারিত পরাধীন জীবন, পুরুষের অপরাধমূলক দৃষ্টান্ত ইত্যাদি যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনই সত্যবতী নারীচরিত্রটির সৃজন, তাঁর প্রতিবাদের ধরণ, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি এ প্রবন্ধে একদিকে রক্ষণশীলতার ও অন্যদিকে নারীমনের অপরাজেয়তার, সংস্কারমুক্তির দিকটিই তুলে ধরা হয়েছে।

Discussion

গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং আশাপূর্ণা দেবী – এই দুই প্রথিতযশা সাহিত্যিক বাংলাভাষার বিখ্যাত দুই ট্রিলজির রচয়িতা। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'কলকাতার কাছেই' এবং আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' - দুটি উপন্যাসই তাঁদের রচয়িতাদের বিখ্যাত ট্রিলজির প্রথম উপন্যাস। দুটি ট্রিলজিই বৃহৎ কালখন্ডের প্রেক্ষাপটে রচনা করা হয়েছিল। ট্রিলজির প্রথম উপন্যাস হিসেবে এই দুই উপন্যাসে উনিশ শতকের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের অসংখ্য দিক, নানা বিষয়, নানা ঘাত-প্রতিঘাত রয়েছে, তার মধ্যে বাংলার নারীর অবস্থান বিশদভাবে দুটি উপন্যাসেই দেখা যায়। দুই ঔপন্যাসিকের নিজস্ব শৈলী ও চিন্তনে তা শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপিত।

১৯০৮ সালের ৮ই নভেম্বর গজেন্দ্রকুমার মিত্রের জন্ম হয় কলকাতাতে। তিনি শৈশবে পিতৃহীন হন। কাশীর অ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুলে তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। পরে তিনি কলকাতায় ফেরেন এবং বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করেন। বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের পর তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশোনা করেছেন। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে লেখক শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। স্কুল জীবন থেকেই গজেন্দ্রকুমার সাহিত্য চর্চা করতেন। ১৯৪৯ সালে বন্ধুর সঙ্গে তিনি মাসিক পত্রিকা 'কথাসাহিত্য' প্রকাশ করেন। আজীবন তিনি এই পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। স্কুল জীবনের সুহৃদ সাহিত্যিক সুমথনাথ ঘোষের সঙ্গে পরবর্তীতে যৌথভাবে প্রতিষ্ঠা করেন 'মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, যা বাংলা পুস্তক প্রকাশনা জগতে এক বিখ্যাত নাম। সামাজিক উপন্যাস, পৌরাণিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় গজেন্দ্রকুমার মিত্র ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ছোটগল্প, কিশোর সাহিত্য রচনাতেও তাঁর লেখনীর অবাধ গতিবিধি। গজেন্দ্রকুমারের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'মনে ছিল আশা'। 'কলকাতার কাছেই', 'উপকণ্ঠে', 'পৌষ ফাগুনের পালা' – এই ট্রিলজি লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃজন। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনকে অবলম্বন করে তিনি 'পাঞ্চজন্য' নামে পৌরাণিক উপন্যাস রচনা করেন। 'রাত্রির তপস্যা', 'বহ্নিবন্যা', 'নারী ও নিয়তি', 'রাই জাগো রাই জাগো', 'আমি কান পেতে রই', 'রাখাল ও রাজকন্যা', 'আদি আছে অন্ত নেই' – ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কথাসাহিত্য'-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৫২-৫৫ সালে। ১৯৫৭ খৃস্টাব্দে উপন্যাসটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী। ১৯৫৯ সালে উপন্যাসটি আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এই উপন্যাসের পটভূমিরূপে লেখক নির্বাচন করে নিয়েছেন উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিলগ্নকে। উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলিই

এই কাহিনির যথার্থ বাহিকাশক্তি এ কথা অস্বীকারের কোন উপায় নেই। 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসের শুরুতে শ্যামাসুন্দরীকে দেখা যায়। এ উপন্যাসে সবথেকে দৃঢ় নারীচরিত্র বলা যেতে শ্যামাসুন্দরীর মা রাসমণিকে। রাসমণি রাশভারি, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাঁর নিজের জীবন যথেষ্ট দুঃখময়। আটান্ন বছর বয়সী এক ধনী বৃদ্ধ জমিদার নৌকা থেকে তেরো বছরের কিশোরী রাসমণিকে দেখে মুগ্ধ হন। ধনসম্পদের প্রাচুর্যের কারণে সহজেই তিনি রাসমণির পিতা-মাতাকে বিবাহে সম্মত করাতে পারেন। সেকালের অধিক বয়সের ব্যবধানে বিবাহের প্রচলন ছিল, ফলে রাসমণির বিবাহ হয়ে যায়। কিন্তু বৃদ্ধ জমিদারের যখন মৃত্যু হয় তখন রাসমণি যৌবনবতী। তিন শিশুকন্যা তাঁর কোলে। রাসমণির দেবররা অচেতন নিরক্ষর জমিদারের টিপসই নিয়ে রাসমণিকে স্ত্রীর ন্যায্য সম্পত্তিতে বঞ্চিত করে। নিজের গহনা বিক্রয়- করা সামান্য কিছু টাকায় রাসমণিকে দিনযাপন ও কন্যাদের মানুষ করতে হয়। বিধবা হবার পর নারীদের বঞ্চিত করে এক অসহায় জীবনে ঠেলে দেওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্ত মর্মান্তিকভাবে উপস্থাপিত করেছেন লেখক এই অংশে।

রাসমণি অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে গেলেও স্বভাব ও মানসিকতা নষ্ট করেননি কখনোই। বরং অভিজ্ঞতা তাঁকে দিয়েছে বুদ্ধিবল। নিজে জীবনে প্রতারিত হয়েছেন, মুখের কথায় বিশ্বাস না করে জীবন-অভিজ্ঞতা তাকে যাচাই করে নেওয়া শিখিয়েছে। তাই ঘটকের কথায় নয় বরং রাসমণি না দেখে জামাই করেন না তার কোন মেয়ের। সাধারণত এই কাজগুলি সে সময়ে বাড়ির পুরুষকর্তারা করতেন। কিন্তু রাসমণিকে নারী হয়েও বাড়ির অভিভাবক হতে হয়েছিল এবং তিনি তার সাধ্যমত দায়িত্ব পালনও করতে পেরেছিলেন। 'অবলা নারী'র যে ধারণাটি সমাজপ্রচলিত, গজেন্দ্রকুমারের রাসমণি যেন তার জাজ্বল্যমান প্রতিবাদ।

রাসমণি শুধু মেয়েদের বিয়ে দিয়েই তার দায়িত্ব শেষ করেননি, বিয়ের পরেও শ্যামাসুন্দরীর স্বামীর অকর্মণ্যতা, অপদার্থতা, রোজগারহীনতার কারণে বিবাহিতা মেয়েকে আবারও বাড়িতে স্থান দিয়েছেন প্রয়োজনমত। নরেনের স্বামীর অপদার্থতা তাকে পীড়া দিত। দরকারে জামাইকে বাড়িতে ঢুকতে না দেওয়ার মত কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেও তিনি পিছপা হননি। তার মেয়ে উমার স্বামীগৃহে স্থান না হওয়ায় তিনি পুনরায় উমাকে বাড়িতে নিজের কাছে এনে রাখেন। গোঁয়ার, অত্যাচারী স্বামীর হাতে মেয়েদের লাঞ্ছনার দিকটি তিনি দরদ দিয়ে বুঝতেন। উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরীর লাঞ্ছনা প্রসঙ্গে আছে, 'বিশেষ করে যেদিন গালে পাঁচ আঙুলের দাগসুদ্ধ মেয়ে ভোরবেলা বেরিয়ে এল সেদিন আর ওর মা রাসমণি স্থির থাকতে পারলেন না।তিনি খুব রাশভারী মানুষ ছিলেন, একা মেয়েছেলে তিনটি বালিকা নিয়ে বাস করলেও কেউ একটা কথা বলতে সাহস পেত না কোনদিন। তিনি ঘরে ঢুকে সোজা তর্জনী দিয়ে সদর দরজা দেখিয়ে জামাইকে বললেন,

> 'যাও, আভি নেকাল যাও। আর কোনদিন এ দরজায় ঢুকো না। মেয়েও আর আমি পাঠাবো না। বুঝবো মেয়ে আমার বিধবা হয়েছে – যাও বলছি।'"[১]

রাসমণি উনিশ শতকের শেষদিকে দাঁড়িয়ে যথার্থ প্রগতিশীল নারীর মত আচরণ করেছেন এক্ষেত্রে, অনেক ব্যাপারে তার অনেক রক্ষণশীলতা থাকলেও সন্তানকে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে মানিয়ে নিয়ে চলার পরামর্শ না দিয়ে বরং যতদিন সম্ভব তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করে তাদের পৃষ্ঠবল হয়েছেন। এখানেই তার প্রকৃত আধুনিকতা।

রাসমণির কন্যা শ্যামাসুন্দরীর বিয়ে হয়েছিল ঠিক দশ বছর বয়সে। শ্যামার মা রাসমণি শিক্ষিতা ছিলেন এবং তিনি মেয়েদেরও বাংলা লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তাদের বাড়িতে বাংলা বইয়ের সম্ভার ছিল যথেষ্ট। ফলে অন্য এক ধরণের রুচির মধ্যে শ্যামা বেড়ে উঠছিল। রূপ ও কুল দেখে শ্যামার বর নির্বাচন করা হলেও নরেনের স্বভাব ছিল অতীব কর্কশ। দশ বছরের মেয়ে বিয়ের রাতেই সেই বিষয়টি বুঝতে পারে, বিবাহ নামক মধুর স্বপ্ন তার খানখান হয়ে যায়। সেই সময় থেকেই সে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করত। কিন্তু তবুও যে সময়টা সে মায়ের কাছে এসে থাকত বা কিছুকাল পড়ে গুপ্তিপাড়ায় স্বামীসঙ্গহীন হয়ে থাকত, তখনও এই অত্যাচারী স্বামীর জন্যও তার মন কেমন করত। কিন্তু নরেনের স্বভাবের কারণে তার প্রতি একটা বিমুখভাব থাকলেও বিবাহিত জীবনের যৌন আকর্ষণ সে রোধ করতে পারেনি। এই ক্ষেত্রে লেখক নারীর স্বাভাবিক শারীরিক চাহিদার দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছেন। শ্যামার বোন

উমা স্বামীসঙ্গলাভ করতে পারেনি, উপযুক্ত বয়স তথা বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও সে চিরকুমারী হয়ে যেন মায়ের কাছে থাকছিল। তার মনে হত,

> "না-ই বা স্বামী তাঁকে নিয়ে ঘর করলেন – শ্বশুরবাড়ি না-ই বা যেতে পেলে সে – এক-আধবারও যদি তিনি আসতেন ধন্য হয়ে যেত সে। দুটি একটি রাত্রির সঙ্গলাভও যদি সে করতে পারত।"[২]

নারীর অবদমিত কামনা-বাসনার দিক, নারীর অন্তরমহলে লুকিয়ে থাকা ইচ্ছের স্বাভাবিক রূপায়ণে গজেন্দ্রকুমার তার লেখনীকে নিরস্ত করেননি। এখানে লেখক নারীমনের সুনিপুণ রূপকার।

যে সময়ের কথা গজেন্দ্রকুমার 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসে লিখেছেন, সেই সময়ে সংসার প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করত পুরুষরা, নারীর উপার্জনের বিষয়টি তখনও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু অকর্মণ্য স্বামীর পরিবার, সন্তানের প্রতি অকর্তব্যের কারণে নিজের জীবনে ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচতে এবং সন্তানদের বাঁচাতে নারীকে উপার্জনশীল করে তোলার একটা প্রয়াস উপন্যাসে দেখা গিয়েছে। দারিদ্র্যের এই দিকটি মুখ্যত শ্যামার চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক –

> "স্থির হ'ল যে বাগানে যা নারকেল পাতা পড়বে – মায় গাছ ঝাড়িয়ে যা কেতে ফেলা হবে, সব শ্যামা পাবে, তা থেকে ঝাঁটার কাঠি করিয়ে শ্যামা শহরে বিক্রি করতে পাঠাবে...।"[৩]

ধীরে ধীরে সংসারের দায়িত্ব সামলে অকর্মণ্য পুরুষটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে, এমনকি উপযুক্ত কারণে তার গালে চড় বসাতেও ভয় পায় না শ্যামা।

রাসমণি অনেক ব্যাপারে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিলেও কিছু কিছু সাধারণ সামাজিক সংস্কার তার অবশ্যই ছিল। মেয়ে উমাকে দজ্জাল শাশুড়ি ও উদাসীন স্বামীর কারণে মায়ের কাছে থাকতে হয়েছিল। তার ভরণপোষণের দায়িত্ব রাসমণি নিলেও তাকে থিয়েটারের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পাঠাতে চাননি কাজের সুযোগ আসা সত্ত্বেও। এককড়ি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে লেখাপড়া শেখানোয় কোনও নিন্দে নেই, তবু তিনি অনড়। সেই সময়ের নারী-পরিসরে এই লোকলজ্জা, নিন্দা-অপবাদের ভয় যথেষ্ট প্রবল ছিল এই বিষয়টিই দেখাতে চেয়েছেন লেখক। কিন্তু পাশাপাশি রাসমণির পরের প্রজন্ম উমার মধ্যে দিয়ে সে সমস্ত সংকোচ-শঙ্কা কাটিয়ে তুলেছেন লেখক। সে ভেবেছে মায়ের অবর্তমানে নিজের ভবিষ্যৎ। এই ভাবনার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই বরং নিজের অধীত বিদ্যার দ্বারা নিজের খরচ চালানোর সাহসিকতাই এখানে এক নারীর মধ্যে জয়যুক্ত হয়েছে।

এবার আসা যাক 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' প্রসঙ্গে। ১৯০৯ সালের ৮ই জানুয়ারি উত্তর কলকাতার পটলডাঙ্গার মাতুলালয়ে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র রচয়িতা আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম। সামাজিক-পারিবারিক প্রতিকূলতার কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পাননি। আশাপূর্ণা দেবীর মা সরলাসুন্দরী দেবী ছিলেন একনিষ্ঠ সাহিত্যপাঠিকা। সেকালের বিখ্যাত পত্রপত্রিকাগুলির তিনি ছিলেন নিয়মিত পাঠিকা। আশাপূর্ণা দেবী মাতৃসান্নিধ্য তাঁকে সাহিত্যমুখী করে তুলেছিল। তাছাড়া তাঁর নিজেরও ছিল সাহিত্যচর্চার অদম্য বাসনা। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়েছিল 'শিশুসাথী' পত্রিকায় যা ছিল একটি কবিতা। তবে পরবর্তীতে মূলত কথাসাহিত্যের জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় স্থান লাভ করেন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণনগর নিবাসী কালিদাস গুপ্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ ঘটে। আশাপূর্ণা দেবীর লেখা প্রথম ছোটদের বই 'ছোট ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা' প্রকাশিত হয় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে এবং প্রাপ্তমনস্কদের জন্য রচিত উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫১ বঙ্গাব্দে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুল কথা', 'বলয়গ্রাস', 'যোগ বিয়োগ', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'নদী দিক হারা', 'শশীবাবুর সংসার', 'নির্জন পৃথিবী', 'ছাড়পত্র' প্রভৃতি তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্যের অসামান্য কিছু মণিমুক্তো। ছোটগল্প ও শিশুকিশোর সাহিত্যও তিনি রচনা করেছেন। রবীন্দ্র পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, শরৎ পুরস্কার, ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী', বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দেশিকোত্তম' প্রভৃতি একাধিক পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিতা হয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী।

আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' প্রকৃতপক্ষে তাঁর তিন খন্ডে লেখা ট্রিলজির প্রথম উপন্যাস। এর পরবর্তী দুটি উপন্যাস হল 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুল কথা'। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যবতী। সত্যবতীর দৌহিত্রী বকুল, সে সুবর্ণলতার কনিষ্ঠা কন্যা। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের শুরুতে লেখিকা জানিয়েছেন,

"সত্যবতীর গল্প আমার লেখা নয়। এ গল্প বকুলের খাতা থেকে নেওয়া।"[৪]

সময়ের ধারাপথে বকুল তাঁর মা-দিদিমাদের থেকে স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে। আর এই এগিয়ে চলার পথ তৈরির কথাই যেন বকুলের কলমে সত্যবতীর কথা। উত্তরকালের উত্তরসূরীর সশ্রদ্ধ স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি পূর্বসূরীকে। সে কারণেই 'বকুল বলেছে, "আমার গল্প যদি লিখতেই হয় ত সে আজ নয়! পরে।"[৫] জীবনের দীর্ঘপথ পার হয়ে এসে বুঝতে শিখেছে বকুল, "পিতামহী, প্রপিতামহীর ঋণশোধ না করে নিজের কথা বলতে নেই।"[৬] এই ট্রিলজিতে আপাতভাবে একটি বংশধারার কাহিনি থাকলেও আসলে এই ট্রিলজি বাংলার মেয়েদের কথা বলে, ব্যক্ত করে তাঁদের সংগ্রামের ইতিহাস, অন্তঃপুরবন্দিনীদের শৃঙ্খলমোচনের নেপথ্য কাহিনী। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক গোপা দত্ত ভৌমিক বলেছেন,

> "অগ্রগতি ও পিছুটান সমেত একটি গোটা যুগের ইতিহাস একটি গৃহবধূর জীবনদর্পণে প্রতিফলিত করেছেন আশাপূর্ণা দেবী। আমাদের দেশে মানবী বিদ্যাচর্চায় এই গ্রন্থটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিস্ময়ের ব্যাপার হল কোথাও কিন্তু তিনি তথ্যের স্তূপ গড়ে তোলেননি, সাল তারিখের পঞ্জী বানাননি কিন্তু উপন্যাসের বুনোটে স্বচ্ছ ইতিহাস চেতনাকে সর্বদা প্রচ্ছন্ন রেখেছেন।"[৭]

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র মূল চরিত্র সত্যবতীর জীবন তিনটি পর্যায়ে উপন্যাসে পাওয়া যায়। প্রথমত, নিত্যানন্দপুরের পিতৃগৃহ পর্ব, এরপর বারুইপুরের শ্বশুরালয়ে অবস্থানকাল এবং তারপর কলকাতায় অবস্থানপর্ব ও শেষাবধি সংসার ত্যাগ। এই উপন্যাস সত্যবতীর জীবনালেখ্য তো বটেই, তারই সঙ্গে উনিশ শতকের অনেক মেয়েদের কথা, তাঁদের অবরোধের জীবনযাত্রা বিশদে অথবা একটি-দুটি তুলির আঁচড়ে সপ্রতিভতার সঙ্গে উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন লেখিকা। সত্যবতীর জীবনের তিনটি পর্যায়েই পার্শ্বচরিত্ররূপে এই সকল অবরোধবাসিনীদের দেখা মেলে। উপন্যাসের নিহিত সত্যকে উদ্ভাসিত করে তুলতে যাদের প্রয়োজন নিতান্ত নগণ্য নয়। আলোচক অনন্যা বড়ুয়ার অভিমত,

> "প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে যে সমাজের বর্ণনা আছে, সেখানে অনিবার্যভাবে যে প্রশ্নটা পাঠকচিত্তকে নাড়া দেয় তা হল এই প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থানটা কোথায়।"[৮]

শুধু সত্যবতী নয়, সব অবরোধবাসিনীদের নিয়েই আসলে এই উপন্যাসে নারীর অবস্থান চিত্রিত এ কথা মনে রাখা জরুরি।

সত্যবতীকে প্রাথমিকভাবে উপন্যাসে দেখা যায় নিত্যানন্দপুরে তাঁর পিতা রামকালী চাটুয্যের গৃহে। বিবাহিতা কন্যা হওয়া সত্ত্বেও সে পিতৃগৃহেই অবস্থান করছিল। সেই সংসারের অনেক মানুষের ভিড়েও তার অবস্থানটি চোখে পড়ার মতো। সমাজে তথা পরিবারে প্রচলিত রীতিনীতি শিক্ষার পাঠ নিতে যে তাঁর ঘোরতর আপত্তি তা তার কথাবার্তা ও আচরণে বেশ বোঝা যায়। সে কারণে মহিলামহলের কর্ত্রীদের তিরস্কারবাক্য ও সতর্কবাণী প্রায়ই শোনা যেত, 'মুখে মুখে চোপা করিসনি সত্য, অব্যেস ভালো কর'[৯], 'বলি শ্বশুরঘর যেতে হবে না?'[১০] বলা বাহুল্য, এই ধরণের শাসনপদ্ধতি উনিশ শতকীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। যদিও সত্যবতী এই সময় থেকেই সমাজশাসনের খুব একটা তোয়াক্কা করেনি। 'The Second Sex' গ্রন্থে Simone De Beauvoir তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন, "One is not born, but rather becomes, woman."[১১] মল্লিকা সেনগুপ্ত সিমনের এই বক্তব্যের সূত্র ধরে বলেছেন, 'তার সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কোড অভ কন্ডাক্টের বিধিনিষেধ। লিঙ্গের কৃত্রিম ধারণা ও বিভাজন আরোপ করে সমাজ।'[১২] নারীর জন্য বিশেষভাবে তৈরি সমাজের এই কোড অভ কন্ডাক্টের ধারণা আলোচ্য উপন্যাসে ভালোভাবেই পাওয়া যায়।

সত্যবতী সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তার যুক্তিবাদী মনকে শানিয়ে তুলছিল, অন্যদিকে তার বিপরীতে ছিল সনাতনপন্থীদের দল। উনিশ শতকের বাংলার সমাজে বৃহত্তর ক্ষেত্রে রামমোহন, বিদ্যাসাগরদের চেষ্টায় যে সকল সমাজ-সংস্কারগুলি ঘটেছিল তার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রক্ষণশীলদের গোষ্ঠী অন্তরায় হয়েছিল তা সত্য। এই উপন্যাসে অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার ইতিহাসেও যেন এই রক্ষণশীলতা বনাম প্রগতির দ্বন্দ্ব তার ঘরোয়া রূপ নিয়ে চিত্রায়িত হয়েছে গৃহ-আঙিনার চৌহদ্দিতে। এই রক্ষণশীলদের সংখ্যাই অধিক। মেয়েমহলে বয়স্কা আচারনিষ্ঠা বিধবা চরিত্র উনিশ শতকীয় সমাজের একটা পুরাতনপন্থার প্রতীকের মত কাজ করেছে এই উপন্যাসে। রামকালীর ঠাকুমাকে দিয়ে যার শুরু। রামকালী একদিনের নিত্যপূজার দায়িত্ব পেলে তা পালন করতে গিয়ে অতি-উৎসাহের চোটে দেবতাকে তৃষ্ণার জল

দিতে বিস্মৃত হন। রামকালীর ঠাকুমা, অর্থাৎ জয়কালীর পিসিমা তার এই চরম ভুলটি ধরে ফেলেন- 'রামকালীর ঠাকুমা ঠাকুরঘর মার্জনা করতে এসে টের পেলেন সে ভুল। টের পেয়ে ন্যাড়া মাথার উপর কদমছাঁট চুল সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠল তাঁর।'[১৩] উপন্যাসের বীজ এই ঘটনার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল। সামান্য ভুল, যা পরবর্তী ক্ষেত্রে শুধরে নেওয়ার যোগ্য, তার জন্য গৃহত্যাগ করতে হয় রামকালীকে। এবং রামকালীর এই অনমনীয় আপসহীন মনোভাব পরবর্তীতে সত্যবতী-সুবর্ণলতার মানসিকতার বীজ। আর এই রামকালীর ঠাকুমা যে সনাতনপন্থাকে ধারণ করেছেন, তার উত্তরসূরি জয়কালী, মোক্ষদা, এলোকেশী এবং আরও পরে মুক্তকেশী। পিতৃগৃহে প্রত্যাগত বিধবা চরিত্রদের মধ্যে জয়কালীর পিসিকে সামান্য সময়ের জন্য পেলেও উপন্যাসে একটা বড় ও প্রয়োজনীয় অংশ জুড়ে রয়েছেন মোক্ষদা চরিত্রটি, যা প্রায় ওই চরিত্রটিরই অনুরূপ। আসলে উনিশ শতকের গ্রামীণ সমাজে যুক্তিবাদী চরিত্রগুলির পাশে বৈপরীত্য সৃজনে লেখিকা এদের বারবার নিয়ে এসেছেন। মোক্ষদাও এইসব আচার-বিচার, ছোঁয়া, জাত-বর্ণ ইত্যাদি বিচার করে চলতেন এবং শুধু তাই নয় অন্যদেরও তাঁর বিধিবিধান মানতে একপ্রকার বাধ্য করতেন। যদিও সত্যবতী তার এই ধরণের কাজকর্মে ছিল মূর্তিমতী প্রতিবাদস্বরূপ। সমালোচক রবিন পাল তাঁর লেখা 'স্ত্রী-শিক্ষা, উনিশ শতক, প্রথম প্রতিশ্রুতি' প্রবন্ধে বলেছেন,

> "সত্যবতীকে তার স্রষ্টা প্রতিবাদিনী রূপেই এঁকেছেন। সত্যবতী অতি বাল্য থেকেই বিস্তর গালাগালি খেয়েছে, বিস্তর গালাগালি দিয়েছে।"[১৪]

কুসংস্কারের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে সত্যবতীর যুক্তিবাদী মন সদা সজাগ থাকত।

সেই সময় মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ ব্যপকভাবে ছিল না। অর্থোপার্জনেরও সুযোগ ছিল না। গৃহকোণই ছিল তাদের একমাত্র স্থান। রন্ধন ও অন্যান্য গৃহকর্ম ছিল তাদের প্রাত্যহিক কৃত্য। আলোচক তন্দ্রিতা ভাদুড়ী লিখছেন, 'পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর কাজ গার্হস্থ্য কাজ।'[১৫] জীবনের বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না এবং শিল্পের বিভিন্ন শাখা যেমন সঙ্গীত নৃত্য ইত্যাদি চর্চার অনুমতিও সাধারণ গ্রামসমাজের বাঙালি গৃহে একেবারেই থাকত না। সমালোচক গোলাম মুরশিদ তাঁর 'নারীপ্রগতির একশো বছর : রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া' গ্রন্থে জানিয়েছেন,

> "মহিলারা লেখাপড়া জানবেন অথবা সংগীতের মতো কোনো গুণাবলি আয়ত্ত করবেন- সাধারণভাবে এটা প্রত্যাশিত ছিল না।"[১৬]

ফলস্বরূপ তাদের সুপ্ত অন্তর্লীন শৈল্পিক মন অনেক ক্ষেত্রেই রন্ধন, গৃহসজ্জা, সূচিশিল্প ইত্যাদির সূক্ষ্ম চর্চায় নিয়োজিত হত। এসব কাজ গার্হস্থ্যধর্মী বলে কোনও বিধিনিষেধ থাকত না। প্রয়োজনের থেকেও বেশি নানা মুখরোচক সুখাদ্য তৈরির এই পুরনো ঐতিহ্য গ্রামবাংলার নিজস্ব। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে তৎকালীন মেয়েদের এই দিকটি দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে দীর্ঘদিন চর্চা ও অভিজ্ঞতায় এই শিল্পে নিপুণা হয়ে উঠতেন, উপন্যাস থেকে উদাহরণ দেওয়া যায়, 'কিন্তু তিলের নাড়ুটি সম্পূর্ণ মোক্ষদার ডিপার্টমেন্ট। কারণ তিলের নাড়ুর অমন হাত নাকি – শুধু এ গ্রামে কেন – এ তল্লাটে নেই।'[১৭] আরও বলা হয়েছে, 'বড়ি দিতে দিতে মোক্ষদার হত্তেল রঙ কালসিটে মেরে যায়। তবে জিনিস যা হয় তাক লাগবার মত। ডাকসাইটে হাত।'[১৮] আমতেল, নাড়ু, গুড় আম, মশলা আম কুমড়ো বড়ি, পোস্ত বড়ি, আনন্দনাড়ু, পক্কান্ন, মুড়কির মোয়া প্রভৃতি মেয়েদের হাতে তৈরির উল্লেখ করেছেন লেখিকা।

শুধু রান্নাই নয়, মেয়েদের ব্রতধর্ম পালনের কথাও আছে উপন্যাসে। এটিও বাংলার এক পুরোনো ঐতিহ্য। বর্তমানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের ব্রতপালনের প্রথা অনেকটা কমে আসলেও যে সময়ের কথা লেখিকা বলতে চেয়েছেন উপন্যাসে, সে সময়ের গ্রাম বাংলার মেয়েদের মধ্যে ব্রতপালনের খুবই রেওয়াজ ছিল। তবে সমাজসচেতন লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী এর মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন নারীর অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ। উপন্যাসে সত্যবতীর পিসঠাকুমা সত্যবতী, ফেন্তু আর পুণ্যিকে 'সেঁজুতি' ব্রত ধরিয়েছেন। সতীন-কন্টক উৎপাটনের বাসনাতেই এই ব্রত করা হত। উপন্যাসে রাসুর বৌ সারদার জীবনের মধ্য দিয়ে সেকালের পুরুষের বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে নারীজীবনের অসহায়তা ব্যক্ত হয়েছে। নিজেদের মতো করে মেয়েরা সে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করত। তারই নিদর্শন এই সেঁজুতি ব্রতর মধ্যে পাওয়া যায়। তাই সে ব্রতর মন্ত্র নিম্নরূপ –

"অশ্বথ কেটে বসত করি,
সতীন কেটে আলতা পরি।
ময়না ময়না ময়না,
সতীন যেন হয়না।"[১৯]

আশাপূর্ণা দেবী যে সময়ের প্রেক্ষাপটে সত্যবতীকে সৃজন করেছেন, সে সময় ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্র ছাড়া খুবই অল্প বয়সে সাধারণত মেয়েদের বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল এবং তারপর কালেভদ্রে কোনও উৎসব- অনুষ্ঠানে পিতৃগৃহে আসা চলত। শৈশবের চিরস্নেহময় সেই গৃহ ছেড়ে চলে যাওয়া এবং আর খুব একটা প্রত্যাবর্তনের সুযোগ না থাকা নারীজীবনের একটা দুঃখজনক দিক। সেখানে দূরাঞ্চলে বিবাহ হলে সেই দুঃখ ছিল অবশ্যম্ভাবী। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে সত্যবতীর মত শক্ত মেয়েও এই প্রসঙ্গে চোখের জল ফেলেছে এবং বলেছে,

"একটা মাত্তর মেয়ে আমি তোমাদের, চোখছাড়া দেশছাড়া করে এক অ-গঙ্গার দেশে বিদেয় করে দিয়েছ, মায়া-মমতা থাকলে পারতে তা?"[২০]

বিবাহোত্তর কালে স্বামীগৃহে অনেকক্ষেত্রেই গুরুজনদের তর্জন-গর্জন, শাসন এমনকি অন্যায় শাসনের স্বীকার হত। নিত্যানন্দপুরের জটাদার বৌ প্রসঙ্গে জানা যায়, রান্নাবান্না সেরে তিনি যখন খেতে বসেছেন, সেই সময় তার স্বামী পান চেয়েছেন, পান ফুরিয়ে গেছিল বলে জটাদার বৌ পান দিতে পারেননি। এই সামান্য কারণে জটাদার বেয়াক্কেলে রাগ হয়ে যায়। বউয়ের পিঠের ওপর লাথি চালান তিনি। যথারীতি তার মৃতপ্রায় দশা হয়। সত্যবতী এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিল। তবে এতটা নির্মম ভাবে না হলেও তার কপালেও জুটেছিল শাশুড়ির প্রহার। চুল বাঁধতে বসে অল্পবয়সী মেয়ে সত্যবতীর সামান্য নড়াচড়ার কারণেই হোক বা তার মস্ত চুলের গোছা সামলাতে না পারার কারণেই হোক বাঁধা চুল খুলে গিয়েছিল। শাশুড়ির দীর্ঘ সময়ের পরিশ্রমে বাঁধা চুল খুললেও এতে সত্যবতীকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু ব্যর্থতার ক্ষোভে তার পিঠেই মেরে দেন তার শাশুড়ি এলোকেশী। এমনকি চ্যালাকাঠ নিয়েও মারতে উদ্যত হন। পরবর্তীতে সত্যবতী যখন কলকাতায় তখন ভাবিনীর ছোটবোন পুঁটিকে নৃশংসভাবে হত্যা শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনের চরমতম রূপটি দেখিয়ে দেয়। উপন্যাস পাঠে জানা যায় 'অপরাধের মধ্যে একটু হুড়কো-হুড়কো ছিল পুঁটি।'[২১] রোগা-পাকাটি মেয়ে দোজপক্ষের স্বামীর কাছে যেতে স্বাভাবিকভাবেই ভয় পেত। এই অপরাধে মরতে হল তাঁকে। নোড়া দিয়ে ছেঁচে ফেলে খুন করা হয়েছিল তাকে। সত্যবতী এ ঘটনায় পুলিশে চিঠি লিখেছিল সাহসে ভর করে। এতে সত্যবতীর প্রতিবাদী চরিত্রটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, 'বিয়ে করা পরিবারকে মারতে পারো, কাটতে পারো, ছেঁচতে পারো, কুটতে পারো, আর কাউকে আর কাউকে করা যায়?'[২২] - মেয়েটির দিদি ভাবিনীর এই উক্তিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সে সময়ের অনেক অত্যাচারিত নারীজীবনের মূল কথা।

স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার উনিশ শতকীয় সমাজ-সংস্কারের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বাংলার নারীদের মধ্যে এমনকী পুরুষদের মধ্যেও যে কত ধরণের অশিক্ষাপ্রসূত ভাবনা লুকিয়ে থাকত এবং পরিবার তথা সমাজকে বিষাক্ত করে তুলত তা এই উপন্যাসে বারবার দেখিয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী। সত্যবতী সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সত্যিই ব্যতিক্রমী চরিত্র। শৈশব থেকে কলকাতার উনিশ শতকীয় নবজাগরণের আবহাওয়া সে পায়নি, কিন্তু তার বাবা রামকালীর মত অসামান্য ব্যক্তিত্বকে সামনে থেকে দৃষ্টান্তরূপে দেখেছে। সত্যবতীর পরম আগ্রহে রামকালী তাকে শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। অনেক ছোট থেকেই কলকাতায় আসতে চাইত সত্যবতী। পরবর্তীতে সন্তানদের ভালো করে পড়াশোনা শেখানোর তাগিদে কলকাতাতে আসে সত্যবতী অনেক গঞ্জনা বক্রোক্তি সহ্য করেও। বিশেষত কন্যা সুবর্ণর জন্মের পর তাকেও শিক্ষিতা করে তোলার স্বপ্ন ছিল সত্যবতীর। স্বামীকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় বয়স পঁচিশের আগে যেন মেয়ের বিবাহ দেওয়া না হয়। বাল্যবিবাহে ছিল সত্যবতীর ঘোরতর আপত্তি। মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করেছিলেন তিনি। যদিও শেষরক্ষা হয় না, সত্যর অজ্ঞাতসারে তার শাশুড়ি এলোকেশী নাতনির বিয়ে দিয়ে দেন। সত্যবতীর স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এই চরিত্রটির মধ্য দিয়েই নতুন নারী জাগরণের যে আলো দেখা যাচ্ছিল তা সমাজব্যবস্থার কাছে মাথা নোয়ায়নি। সংসার ত্যাগ করেছিল সত্যবতী, স্বামী বা পিতা বা পুত্র কারোরই উপার্জনে জীবনযাপন না করে শেষপর্যন্ত নিজের জীবনযাপন নিজে করবে স্থির করে সত্যবতী। এখানেই প্রবল বিরুদ্ধতার চাপের মধ্যেও তার জয়। সমালোচক

নিলয় বকসী তাঁর 'নারীর অবস্থান-সমস্যা ও উত্তরণের দলিল প্রথম প্রতিশ্রুতি' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন, 'সত্যবতী' - এক সংগ্রামী নারী জীবনের লৌকিক নাম...'[২৩]

আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে আর্থিক দারিদ্র্যের পরিচয় নেই, কিন্তু অন্যান্য অনেক মানসিক বা চিত্তগত দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রগতিশীল নারীর লড়াই উপস্থাপিত হয়েছে। আদর্শের সংঘাত ঘটেছে বারবার। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসে আর্থিক দারিদ্র্য একটা বড় জায়গা নিয়েছে উপন্যাসের মূল বুনটে। সেই সূত্রেই নারীর অবস্থাগত পরিবর্তন, জীবনযাত্রার জয় দেখিয়েছেন লেখক। আসলে দুই রচয়িতার রচনাতেই নারীমনের বিশেষ বিশেষ উত্তরণের দিক নিজস্বতা নিয়ে উপস্থাপিত। এখানেই উপন্যাস দুটির সার্থকতা।

তথ্যসূত্র :

১. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, ষষ্ঠ মুদ্রণ, কার্ত্তিক ১৪২৫, পৃ. ২৪৭
২. তদেব, পৃ. ৩১৯
৩. তদেব, পৃ. ৩৫৩
৪. দেবী, আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফাল্গুন ১৩৭১, আটান্ন মুদ্রণ- কার্তিক ১৪১৭, পৃ. ৩
৫. দেবী, আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফাল্গুন ১৩৭১, আটান্ন মুদ্রণ- কার্তিক ১৪১৭, পৃ. ৩
৬. দেবী, আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফাল্গুন ১৩৭১, আটান্ন মুদ্রণ- কার্তিক ১৪১৭, পৃ. ৩
৭. দত্ত ভৌমিক, গোপা, প্রবন্ধ সংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৭৯
৮. বড়ুয়া, অনন্যা, প্রথম প্রতিশ্রুতির বিশ্লেষণী পাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ – কলকাতা বইমেলা ২০০৬, পৃ. ৭১
৯. দেবী, আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফাল্গুন ১৩৭১, আটান্ন মুদ্রণ- কার্তিক ১৪১৭, পৃ. ১২
১০. দেবী, আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফাল্গুন ১৩৭১, আটান্ন মুদ্রণ- কার্তিক ১৪১৭, পৃ. ১২
১১. Beauvoir, Simone De, The Second Sex, Vintage books, A Division of Random House, INC, New York, First Vintage Books Edition- May 2011, P. 330
১২. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৩
১৩. দেবী, আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফাল্গুন ১৩৭১, আটান্ন মুদ্রণ- কার্তিক ১৪১৭, পৃ. ৫
১৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর, আশাপূর্ণা: নারী পরিসর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ – বইমেলা ২০০৯, পৃ. ৩০
১৫. ভাদুড়ী, তন্দ্রিতা, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের স্বৈরতান্ত্রিক বিশ্লেষণে নারী, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২২৭
১৬. মুরশিদ, গোলাম, নারীপ্রগতির একশো বছর: রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৩, অবসর সংস্করণ - বইমেলা ২০১৩, পৃ. ১
১৭. দেবী, আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফাল্গুন

১৩৭১, আটান্ন মুদ্রণ- কার্তিক ১৪১৭, পৃ. ২৬
১৮. তদেব, পৃ. ২৭
১৯. তদেব, পৃ. ৬৭
২০. তদেব, পৃ. ২০৭
২১. তদেব, পৃ. ৪৫৩
২২. তদেব, পৃ. ৪৫৪
২৩. সাঁফুই, অরুণকুমার, দাস, গৌতম, প্রসঙ্গ আশাপূর্ণা দেবী ও প্রথম প্রতিশ্রুতি, পান্ডুলিপি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- মে, ২০১১, পৃ. ৭৩

গ্রন্থপঞ্জি (বাংলা) :

১. দত্ত, ভৌমিক, গোপা, প্রবন্ধ সংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০১৭
২. দেবী, আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফাল্গুন ১৩৭১, আটান্ন মুদ্রণ- কার্তিক ১৪১৭
৩. বড়ুয়া, অনন্যা, প্রথম প্রতিশ্রুতির বিশ্লেষণী পাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ – কলকাতা বইমেলা ২০০৬
৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর, আশাপূর্ণা: নারী পরিসর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ – বইমেলা ২০০৯
৫. ভাদুড়ী, তন্দ্রিতা, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের স্বৈরতান্ত্রিক বিশ্লেষণে নারী, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০০৫
৬. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, ষষ্ঠ মুদ্রণ- কার্ত্তিক ১৪২৫
৭. মুরশিদ, গোলাম, নারীপ্রগতির একশো বছর: রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৩, অবসর সংস্করণ - বইমেলা ২০১৩
৮. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৪
৯. সাঁফুই, অরুণকুমার, দাস, গৌতম, প্রসঙ্গ আশাপূর্ণা দেবী ও প্রথম প্রতিশ্রুতি, পান্ডুলিপি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- মে, ২০১১

গ্রন্থপঞ্জি (ইংরেজি) :

1. Beauvoir, Simone De, The Second Sex, Vintage books, A Division of Random House, INC, New York, First Vintage Books Edition- May 2011